‘১৯৭১ ভেতরে বাইরে’ অধ্যায়ঃ মুক্তিযুদ্ধ

একটি নিরপেক্ষ এবং নির্মোহ বিশ্লেষন (পর্ব ৫)

এই অধ্যায়ে জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব ৪ এপ্রিলে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে এম, এন, এ কর্নেল ওসমানী (অব) অনুষ্ঠিত সামরিক র্কমর্কতাদের অনুষ্ঠিত সভার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

প্রেক্ষাপটঃ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সুস্পষ্ট ভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্যায় ছিল, ২৫ র্মাচ থেকে ২৫ এপ্রিল প্রাথমিক প্রতিরোধ এবং প্রবাসী সরকার গঠন। দ্বিতীয় পর্যায় ছিল ২০ নভেম্বর পর্যন্ত, মুক্তিবাহিনী গঠন এবং গেরিলা যুদ্ধ। তৃতীয় এবং চুড়ান্ত পর্যায় ছিল, ২১ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ২১ নভেম্বর এর পর যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন তারা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্কৃতি পান নাই। ২১ নভেম্বর থেকে ইন্ডিয়ান র্আমীর আর্টিলারী সীমান্তের অন্য পার থেকে সরাসরি মুক্তিবাহিনীকে সয়াহতা করে এবং ৩ রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে ইন্ডিয়ান র্আমী সীমান্ত অতিক্রম করে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পরে।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ শুরু হয় ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইন আর পিলখানায় ২৫শে র্মাচ রাত্রে। আর পরর্বতী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তা ছড়িয়ে পরে ততকালীন পূব্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ই, পি, আর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট সমূহের মধ্যে। চট্টগ্রামে মেজর রফিক আর চুয়াডাঙ্গায় মেজর আবু ওসমান চৌধুরীর নেতৃত্বে ই, পি, আর উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক সাফল্য র্অজন করে। ২ বেঙ্গল, মেজর শফিউল্লাহ এবং মেজর মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে এবং ৪ বেঙ্গল মেজর খালেদ মোশাররফ এবং মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে কোনরকম ক্ষয়খতি ছাড়াই সাফল্যের সাথে বিদ্রোহ করে। একই সময়ে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৮ বেঙ্গল এই বিদ্রোহে যোগ দেয়।

নিব্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার লক্ষ্যে বব্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অতর্কিতে হত্যজজ্ঞ শুরু করলে এই প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এই প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহনকারীদের (সব্বোচ্চ ৮ থেকে ১০ হাজার) শতকরা ৯৫ ভাগই ছিলেন সামরিক এবং আধা সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং তাদের নেতৃত্ব ছিল স্বাভাবিকভাবেই সামরিক বাহিনীর অফিসারদের হাতে। ৪ এপ্রিলে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে দেশের পূব্বাঞ্চলে অবস্থিত সামরিক র্কমর্কতাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে এম, এন, এ কর্নেল ওসমানী (অব) ছাড়াও দেশের পূব্বাঞ্চলে অবস্থিত তিনটি বেঙ্গল রেজিমেন্ট'এর সিনিয়র অফিসার'রা যেমন মেজর সফিউল্লাহ, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জিয়া এবং মেজর সাফায়াত জামিল প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।প্রসঙ্গত উল্লেক্ষ্য, র্মাচ এর শেষ সপ্তাহে লে কর্নেল সালাহউদ্দীন মোহম্মদ রেজা ঢাকা থেকে পায়ে হেটে সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও, কর্নেল ওসমানী'র বিরাগভাজন হওয়ার কারনে লে কর্নেল সালাহউদ্দীন মোহম্মদ রেজা'কে কখনোই গুরুত্বর্পূন দ্বায়িত্বে দেওয়া হয় নাই।

৪ এপ্রিলে হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে অনুষ্ঠিত সামরিক র্কমর্কতাদের অনুষ্ঠিত সভা ও ১৪ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের উপর উপর জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব'এর বিস্তারিত আলোচনা থেকে অনেক পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন এই ভেবে যে জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন! আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ের এই সর্ম্পুন সময় ধরে তো বটেই, তার পরও আরো র্দীঘ একমাস জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব প্রথম পর্যায়ের প্রতিরোধ যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে সর্ম্পুন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট'এ পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বেতনভূক অফিসার হিসাবে র্কমরত ছিলেন!

একই সময়ে দেশের রংপুরে অবস্থিত ৩ বেঙ্গল বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ করে। যশোরে ক্যান্টনমেন্ট'এর বাইরে অবস্থানরত ১ম বেঙ্গল বিদ্রোহ করতে চাইলে বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালী কমান্ডিং অফিসার কর্নেল রেজাউল জলিলের নির্দেশে যশোর ক্যান্টনমেন্ট'এ ফিরে আসতে বাধ্য হয়। যশোর ক্যান্টনমেন্ট'এ ফিরে আসার পর পরই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী তাদের' পূব্ব-পরিকল্পনা মাফিক প্রায় সবাইকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম বীর উত্তম লে আনোয়ার সেই দিন শহীদ হন। তার সহযোগী লেঃ হাফিজ (কৃতি ফুটবলার এবং পরর্বতীতে প্রতিমন্ত্রী মেজর হাফিজ প্রানে যান) এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

পরর্বতী পর্যায়ে বেসামরিক জনগনের ব্যাপক হারে যোগদানের ফলে মুক্তিযুদ্ধের চুড়ান্ত পর্যায়ে এই সংখ্যা উন্নীত হয় ১ লাখের উপর। যার মধ্যে বেসামরিক (ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবি) মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল ৯০ শতাংশের মত।

এই পর্যায়ে অনেক বেসামরিক ব্যাক্তি (যেমন শহীদ লেঃ আশফাকুস সামাদ বীর উত্তম, ফুটবলার নুরুন্নবী (পরর্বতীতে মেজর জেনারেল), ব্রাম্মনবাড়িয়া কলেজের ভি পি ও ছাত্রলীগ নেতা জাহাঙ্গীর ওসমান, ক্যাপ্টেন তাজ (প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী), মেজর মুনিব ও মেজর মিজান নামে জমজ দুই ভাই, মেজর কাইয়ুম খান) দুই ব্যাচে সামরিক অফিসার হিসাবে প্রশিক্ষন গ্রহন করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

আমদের মুক্তিযুদ্ধে'র পর সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিজেদের মধ্যে বীরত্বসুচক খেতাব ভাগাভাগির ফলে হাজার হাজার বেসামরিক গেরিলাদের চরম সাহসিকতা আর আত্মত্যাগ' ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যায়। জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব সরাসরি কোন যুদ্ধে অংশগ্রহন না করেও কি ভাবে সাহসিকতার জন্য বীর উত্তম খেতাব'ধারী হলেন তা নিয়ে পরর্বতী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বইয়ের ৯৪ পৃষ্ঠায় জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব সাহেব মুক্তিযোদ্ধা নিব্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত এম, এন, এ দের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে প্রশ্ন করেছেন, যে "ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক এই ধরনের বেসামরিক ব্যাক্তি, কি ভাবে মুক্তিযোদ্ধা নিব্বাচন করবে"?

জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব দীর্ঘ ১৮ বছর পশ্চিম পাকিস্তানে থাকার ফলে তার পূব্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও ততকালীন ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ধারনা ছিল খুবই সামান্য। শুধু তাই নয়, তার বইয়ের প্রতি পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে তার ইতিহাস ও গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে তার সীমাহীন অজ্ঞতার কথা। তিনি জানতেন না যে, পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত সব গেরিলা যোদ্ধাই ছিলেন বেসামরিক ব্যাক্তিত্ব! চে- গুয়েভারা ছিলেন ডাক্তার, ইয়াসির আরাফাত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, আর 'দিয়েন বিয়েন ফু'র নায়ক গিয়াপ ছিলেন র্অথনীতি'র শিক্ষক।

জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব ঢালাও ভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমালোচনা করে গিয়েছেন, যা আসলে তার নিজের চারিত্রিক দূব্বলতা, ভীরুতা আর মানসিক দৈন্যতার'ই বহিঃপ্রকাশ। তার লেখা পড়ে মনে হয়, এ যেন কাজে দেরী করে আসার পর কাজে ব্যাস্ততা দেখানোর হ্যাসকর প্রচেষ্টা! তার এই আক্রমন থেকে তার উপরস্থ দুই সাবেক সামরিক বাহিনীর অফিসার ও ১৯৭০ এর নিব্বাচনে নিব্বাচিত এম, এন, এ র্কনেল ওসমানী (অব) এবং এম, এন, এ লে র্কনেল আবদুর রব (অব)'ও পরিত্রান পান নাই!

দুরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ এম, এন, এ র্কনেল ওসমানী (অব) কে মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ দিয়ে মুক্তিবাহিনীর সামরিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে আসেন। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় সেক্টর কমান্ডারদের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রবাসী সরকার ও মুক্তিবাহিনীর সব্বাধিনায়ক এম, এন, এ র্কনেল ওসমানী (অব)'র প্রতি সেক্টর কমান্ডারদের আনুগত্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারন পায়।

এরপর ১১৩ পৃষ্ঠায় জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব আক্রমন করেছেন মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এম, এন, এ কর্নেল ওসমানী'কে নিয়ে! তার বক্তব্য থেকে জানা যায়, এক পর্যায়ে মেজর জিয়া' এম, এন, এ কর্নেল ওসমানী (অব) সরিয়ে জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব'কে প্রধান করে 'যুদ্ধ পরিষদ' গঠন করার প্রস্তাব দেন। এই ক্ষেত্রে জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব'এর অবস্থান ছিল 'আমার আপত্তি নাই" টাইপের।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক অফিসারদের মধ্যে দন্ধের এই ঘটনাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বর্পূন। ঘটনাটি ছিল মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক অফিসারদের উচ্চাভিলাষের দ্বিতীয় বহিঃপ্রকাশ। জিয়াউর রহমান আর মেজর খালেদ মোশাররফ দুই জনই ছিলেন স্মার্ট, উচ্চাভিলাসী এবং পরস্পরের প্রতিপক্ষ। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন সেক্টর কমান্ডারদের মধে সবচেয়ে সিনিয়র, মেজর সফিউল্লাহর ব্যাচ মেইট হলেও কমিশন পাওয়ার সময় জিয়াউর রহমান সিনিয়র হন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন মেজর খালেদ মোশাররফ।

উচ্চাভিলাশী মেজর জিয়াউর রহমানের উদ্দেশ্য ছিল দুইটিঃ এক মুক্তিবাহিনীকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের আওতার বাইরে এনে সামরিক নেতৃত্বের অধীনে আনতে হবে। দুই বিমান বাহিনীর অধিনায়ক জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব'কে নামে মাত্র মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ পরিষদ এর প্রধান নিয়োগ করলে মুক্তিবাহিনীর আসল নেতৃত্ব তার হাতে চলে আসবে এবং তিনি মেজর সফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফ এর চেয়ে ক্ষমতার দৌড়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকবেন। স্মার্ট অফিসার খালেদ মোশাররফ ঠিকই জিয়ার উদ্দেশ বুঝে ফেলেন এবং এই প্রস্তাবের চরম বিরোধিতা করেন এবং ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেক্টর কমান্ডারদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় এই তিন সেক্টর কমান্ডারদের এই উচ্চাভিলাস খুবই নগ্নভাবে প্রকাশ পায় পরর্বতীতে।

যুদ্ধ পরিষদ গঠন এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর জিয়াউর রহমান নিজের নামানুসারে জেড র্ফোস নামে ব্রিগেড গঠন করলে, মেজর সফিউল্লাহ ও মেজর খালেদ মোশাররফ পালটা এস র্ফোস এবং কে র্ফোস গঠন করেন; যা ছিল সামরিক আইনের সর্ম্পূন পরিপন্থী। যুদ্ধে যোগদান করতে ৫০ দিন দেরী হলেও, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বিমান বাহিনী গঠন করা হলে জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব নিজের নামে 'কিলো' র্ফোস গঠন করতে দেরি করেন নাই! তাদের দেখাদেখি প্রাক্তন সৈনিক ও ছাত্রনেতা কাদের সিদ্দিকী 'কাদেরিয়া বাহিনী' গঠন করেন।

১১৬ পৃষ্ঠায় জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব' আবারও মনখারাপ করেছেন; তার দুখঃ তাকে ডিঙ্গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীতে তার জুনিয়র লে কর্নেল আবদুর রব (অব) এম, এন, এ কে চিফ অফ স্টাফ করা হয়েছে! তিনি লিখেছেন "তার এক সময়কার জুনিয়র'কে স্যালুট করতে তার কোন সমস্যা হয় নাই কারন তিনি সব কিছু ফেলে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে এসেছেন, পদবীর জন্য আসেন নাই"! তার এই স্বপ্রনোদিত বক্তব্য মনে করিয়ে দেয়, 'ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাই না'র কথা।

আমি জানি না, 'সব কিছু ফেলে' বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে বিশ বছরের বেশী চাকুরী করে ততকালীন উইং কমান্ডার জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব'এর ঢাকা বেইস কমান্ডার না হতে পারলেও, মুক্তিবাহিনীতে কয়েক মাস সময় কাজ করার সুবাদে 'সুপারসনিক গতিতে' উইং কমান্ডার থেক এয়ার ভাইস র্মাশাল পদে উন্নীত হয়েছেন এক বছরেরও কম সময়ে! বিমান বাহিনীর প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। পেয়েছেন তার বীর উত্তম খেতাব (করায়ত্ত করেছেন)!

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রতিটি সরকারের কাছ থেকে যা পেয়েছেন তাই দুহাত ভরে নিয়েছেন জেন্টেলম্যান হিসাবে এই সমাজে পরচিত জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব। জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে পেয়েছেন রাষ্ট্রদূত পদমর্যাদার লোভনীয় চাকুরী, এরশাদের সময় মন্ত্রিত্ব! শেখ হাসিনার সময় আরো একবার মন্ত্রিত্ব। পরর্বতী তিন দশকের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে "আমার পদবীর লোভ নাই" বক্তব্যের অসারতা বার বার ফুটে উঠেছে।

লে কর্নেল আবদুর রব (অব) সম্পর্কে তিনি আবারও লিখেছেন "যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাকে উচ্চ পদ দেওয়া হয়"। তিনি র্আমীর সাপ্লাই কোরে কাজ করেছেন, তাই অপারেশনাল বিষয়ে তার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না"। এই পর্যায়ে এসে তার বক্তব্য রীতিমত ঘ্যানঘানানির মত শুনাচ্ছে এবং তার নিজের যোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব নিজে তো বৈমানিক ছিলেন, সেনাবাহিনীর কোন অফিসার ছিলেন না। গেরিলা যুদ্ধের অপারেশনাল বিষয়ে তার যে কি অভিজ্ঞতা ছিল তা ঢাকা থেকে কুমিল্লা সীমান্ত পার হতে ৫০ দিন লাগার ধরন দেখেই অনুমান করা যায়।

জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব কি সেই সময় জানতেন না ওয়ারেন্ট অফ পিসিডেন্সে এক জন এম, এন, এ আর এক জন উইং কমান্ডার এর অবস্থান কোথায়? প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হিটলার ছিলেন নন কমিশন্ড অফিসার আর বিশ্ব বিখ্যাত র্মাশাল রোমেল, র্মাশাল মোডল, র্মাশাল গুডেরিয়ান ছিলেন মেজর পদে। দুই দশক পর নির্বাচনে হিটলার চ্যান্সেলের পদে নির্বাচিত হলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশ্ব বিখ্যাত র্মাশাল

রোমেল, র্মাশাল মোডল, র্মাশাল হেইন্স গুডেরিয়ান তাদের এক সময়ের অধীনস্থ নন কমিশন্ড অফিসার হিটলার'কে স্যালুট করতে কোন রকম দ্বিধার সম্মুখীন হন নাই।

আমার বন্ধুরা (বিশেষত সামরিক বাহিনীর বন্ধুরা) মনে করতে পারেন আমি জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব'এর নিন্দা করছি। আমিও জনাব এ, কে খন্দকার সাহেব এর মত বলতে চাই (পৃষ্ঠা ১২১) "কেউ কেউ মনে করতে পারেন আমি কারও নিন্দা করছি, কিন্তু আমি কাউকে শুধু নিন্দা করার স্বার্থে নিন্দা করছি না। আমি যা বলছি তা বাস্তব এবং সত্য"।

তথ্যসূত্রঃ

১। চাঁদপুরে নৌ-মুক্তিযুদ্ধ, মো শাহজাহান কবির বীরপ্রতীক
২। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল
৩। 'বিটার সুইট ভিক্টরী, আ ফ্রিডম ফাইটারস টেইল' মেজর কাইয়ুম খান (অব)
৪। একাত্তর আমার; মোহম্মদ নুরুল কাদের
৫। বিদ্রোহী র্মাচ ১৯৭১, মেজর রফিকুল ইসলাম (অব) পি এস সি
৬। মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি র্নিদলীয় ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ ।।
৭। স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন, বেগম মুশতারী শফি
৮। নক্ষত্রের রাজারবাগ, মোশতাক আহমেদ
৯। লক্ষ প্রানের বিনিময়ে, মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম
১০। গেরিলা, জহিরুল ইসলাম
১১। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে, মাহবুব আলম
১২। একাত্তুরের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা', মেজর হামিদুল হোসেন তারেক, বীর বিক্রম

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ৪ এপ্রিল ২০১৫, victory1971@gmail.com